HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৭ : সংগঠন

টপিক – ০১ সংগঠন

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সংগঠন
টপিক ০২: সংগঠনের প্রকারভেদ
টপিক ০৩: এনজিও
টপিক ০৪: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সংগঠন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ভূমিকা (Introduction): প্রকৃতিতে ভূমি নিষ্প্রাণ; শ্রম অযত্নে অবহেলায় অলসভাবে পড়ে থাকে, মূলধন সম্পদ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। সংগঠনই এসব উপকরণকে কোনো বিশেষ উদ্দেশে, ন্যূনতম ব্যয়ে, দক্ষতার সাথে উত্তম প্রযুক্তি নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যবহার করে উৎপাদন তথা উপযোগ সৃষ্টি করে। বর্তমানে মানুষের চাহিদা ও রুচির ব্যাপক পরিবর্তন এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করায় সংগঠন একটি অপরিহার্য ও স্বতন্ত্র উপকরণ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত রূপ লাভ করেছে।

সংগঠন

শুধুমাত্র উপকরণ ভূমি, শ্রম ও মূলধন দ্বারা কোনো কিছু উৎপাদন করা যায় না। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় উপকরণগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে। আধুনিককালে উৎপাদনব্যবস্থা জটিলতর ও ঝুঁকিপূর্ণ আকার ধারণ করছে। প্রযুক্তি ও কলকারখানার আবিষ্কারের মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থার প্রসার, শ্রমবিভাগ, শ্রমিক মালিক সম্পর্ক, মূলধন সংগ্রহ, বিনিয়োগ, দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, তত্ত্বাবধান, যন্ত্রপাতি ও জনবল নির্বাচন প্রভৃতি ক্ষেত্রের সুসমন্বয় সাধনের মাধ্যমে গতিশীল উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করতে সংগঠন একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অধ্যাপক হানির (Prof. Honey) মতে, “কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসমূহ সাধনকল্পে বিশেষায়িত উপাদানের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনকে সংগঠন বলে।”*

অধ্যাপক মিলওয়ার্ড-এর মতে, "কর্ম ও কর্মীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ককে সংগঠন বলে।“

সংগঠন

নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ সংগঠনকে উৎপাদনের একটি আলাদা উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদ সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন না। তাঁদের মতে, সংগঠন হলো একপ্রকার বিশেষ ধরনের শ্রমমাত্র।

তবে বর্তমানে বৃহদায়তন ও জটিল উৎপাদন পরিস্থিতিতে সংগঠনকে উৎপাদনের কেবল পৃথক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা নয় বরং একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সুসমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যে উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, তাকে আমরা সংগঠন বলতে পারি।

সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

(১) সংগঠক ও সংগঠনের অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট রয়েছে।
(২) সংগঠন, সংগঠক ও উদ্যোক্তা এক প্রকার বিশেষ ধরনের শ্রম।
(৩) দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত।
(৪) সংগঠনকে জীবন্ত উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
(৫) উৎপাদনকার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান তথা উৎপাদনের সাথে সংগঠন সম্পৃক্ত।
(৬) সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন ও জনকল্যাণ সাধন।
(৭) সংগঠনের পক্ষে সংগঠক উৎপাদনের যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে।

আধুনিক বৃহদায়তন জটিল উৎপাদনব্যবস্থাকে সুচারুরূপে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার জন্য সংগঠনের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। সে কারণে অর্থনীতিতে সংগঠন একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সংগঠক

১৭২৩ সালে প্রকাশিত ফরাসি অভিধান (Dictionaire Universal De commerce) এ সর্বপ্রথম Enterprendre শব্দটি (যার ইংরেজি শব্দ হলো Entrepreneur অর্থ হলো কিছু করার দায়িত্ব গ্রহণ 'To undertake') ব্যবহৃত হয়।
১৯৩৩ সালে ফ্রান্সে এ সম্পর্কে বলা হয়, বিশেষ করে মূলধন ও শ্রমিকের মধ্যে মধ্যস্থতা করার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনিই উদ্যোক্তা।
অতএব, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে একত্রিত করে তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় সাধনের কাজ যে করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য কোথায়, কীভাবে এবং কী পরিমাণ উৎপাদিত হবে এ পরিকল্পনা যিনি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন, তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। অধ্যাপক মার্শাল 'সংগঠককে' 'Captain of the industry' বলে অভিহিত করেন। যেকোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সফলতা সংগঠকের দক্ষতা, কর্মনিপুণতা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে। তাই উৎপাদনের উপাদানসমূহের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করাই হলো সংগঠকের দায়িত্ব।

সংগঠক

একজন সফল সংগঠক বা উদ্যোক্তার নিম্নরূপ গুণাবলি থাকা আবশ্যক। যেমন- (i) দূরদর্শিতা, (ii) উদ্যোক্তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, (iii) সাংগঠনিক সক্ষমতা, (iv) বুদ্ধিমত্তা, (v) সৃষ্টিশীলতা, (vi) কর্মে একাগ্রতা, (vii) যোগ্য নেতৃত্ব, (viii) আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনচেতা এবং (ix) সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা। এছাড়া সততা, পূর্ব অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, উন্নত চরিত্র-এসব গুণাবলিও একজন সফল উদ্যোক্তার থাকা বাঞ্ছনীয়।

সংগঠক, সংগঠন বা উদ্যোক্তার কার্যাবলী

আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থায় সংগঠক বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করে থাকে। উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তাকে তদারক করতে হয়। সংগঠক যেসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে তা নিম্নরূপ:

১. লক্ষ্য নির্ধারণ: সংগঠক প্রথমে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সে কী করতে চায়, কী অর্জন করতে চায় এবং কীভাবে তা অর্জন করবে, এরূপ সিদ্ধান্ত তাকে প্রথমে গ্রহণ করতে হয়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরবর্তীতে যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

২. পরিকল্পনা প্রণয়ন সংগঠককে লক্ষ্য নির্ধারণের পর উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি গ্রহণ করতে হয়। কোন দ্রব্য, কোথায়, কীভাবে উৎপাদন হবে, কাঁচামালের উৎস কী হবে, দ্রব্য কীভাবে বাজারজাত করা হবে ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সংগঠককে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি গ্রহণ করতে হয়।

৩. উপকরণ সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন: পরিকল্পনা প্রণয়নের পর উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন সংগ্রহ ও সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের সব দায়িত্ব পালন করতে হয়।

৪. মূলধন সংগ্রহ: উৎপাদন কাজের সফল বাস্তবায়নের জন্য মূলধন সংগ্রহ অত্যন্ত প্রয়োজন। উদ্যোক্তা নিজস্ব তহবিল থেকে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

সংগঠক, সংগঠন বা উদ্যোক্তার কার্যাবলী

৫. তত্ত্বাবধান: উৎপাদন কাজের তত্ত্বাবধান ও ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সংগঠকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সংগঠকের দক্ষ পরিচালনার ওপর শ্রমিক ও কর্মচারীদের কাজের পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে।

৬. শ্রমবিভাগের প্রবর্তন: উদ্যোক্তা তার সংগঠনের আয়তন অনুপাতে উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের মাত্রা যথাযথভাবে নির্ধারণ করে থাকে। উৎপাদিত দ্রব্যের মান ও উৎপাদনের পরিমাণ শ্রমবিভাগের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল।

৭. ঝুঁকি বহন: সংগঠকের সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যবসায়ের আর্থিক ও ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহন করা। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে এ ধরনের ঝুঁকি বহন করতে হয় না। উদ্যোক্তার পর্যবেক্ষণ সঠিক হলে, সে মুনাফা করবে, ভুল হলে লোকসান বহন করবে। অন্য কেউ লোকসানের ঝুঁকি বহন করে না।

সংগঠক, সংগঠন বা উদ্যোক্তার কার্যাবলী

৮. বাজারজাতকরণ: উদ্যোক্তাকে ভোক্তার রুচি, পছন্দ, দ্রব্যের মান ও দাম ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ করতে হয়।

৯. বিজ্ঞাপন ও প্রচার: উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং পুরাতন চাহিদাকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা দ্রব্যের প্রাপ্তিস্থান, গুণগত মান ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে থাকে।

১০. যোগাযোগ রক্ষা ব্যবসায়ের সুবিধার্থে উদ্যোক্তা বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

সংগঠক, সংগঠন বা উদ্যোক্তার কার্যাবলী

১১. নতুনত্ব প্রবর্তন: কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান, নতুন দ্রব্যের প্রবর্তন, নতুন বাজারের সন্ধান প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের বিস্তার ঘটায়। অর্থনীতিবিদ জে. বি. ক্লার্কের মতে, 'উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হলো উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং এর প্রবর্তন করা।'

১২. আয় বণ্টন: উৎপাদনের উপকরণের নিয়োগকর্তা হিসেবে সংগঠককে ভূমি, শ্রম ও মূলধনের পাওনা নিয়োগকালীন শর্তানুযায়ী পরিশোধ করতে হয়।

১৩. নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান: উদ্যোক্তাকে তার উৎপাদিত দ্রব্যের নতুন বাজার অনুসন্ধান করতে হয়। এর ফলে দ্রব্যের চাহিদা প্রসারিত হয়, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং উদ্যোক্তার মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

১৪. মুনাফা অর্জন: উদ্যোক্তার সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। উদ্যোগ গ্রহণ, উৎপাদনকার্য পরিচালনা এবং ঝুঁকি বহনের পারিতোষিক হিসেবে উদ্যোক্তা এ মুনাফা অর্জন করে।

১৫. প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি: উদ্যোক্তা কম খরচে তার উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান উন্নত করে, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করতে পারে।

১৬. ভোক্তাদের আস্থা বৃদ্ধি: সংগঠকের কার্যাবলির মূলে রয়েছে ভোক্তাদের আস্থা অর্জন। যদি সে ভোক্তাদের আস্থা অর্জন করতে পারে তবে সে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গণ্য হবে। সাজনায়

সুতরাং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বা উদ্যোক্তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৭ : সংগঠন

টপিক – ০২ সংগঠনের প্রকারভেদ

সংগঠনের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংগঠনের প্রকারভেদ

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিনিয়তই সংগঠনের রূপ, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, আয়তন, আকার ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। মালিকানা, আয়তন, গঠন পদ্ধতি ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগঠনের প্রকারভেদ নিম্নে প্রবাহ চিত্রে দেখানো হলো:

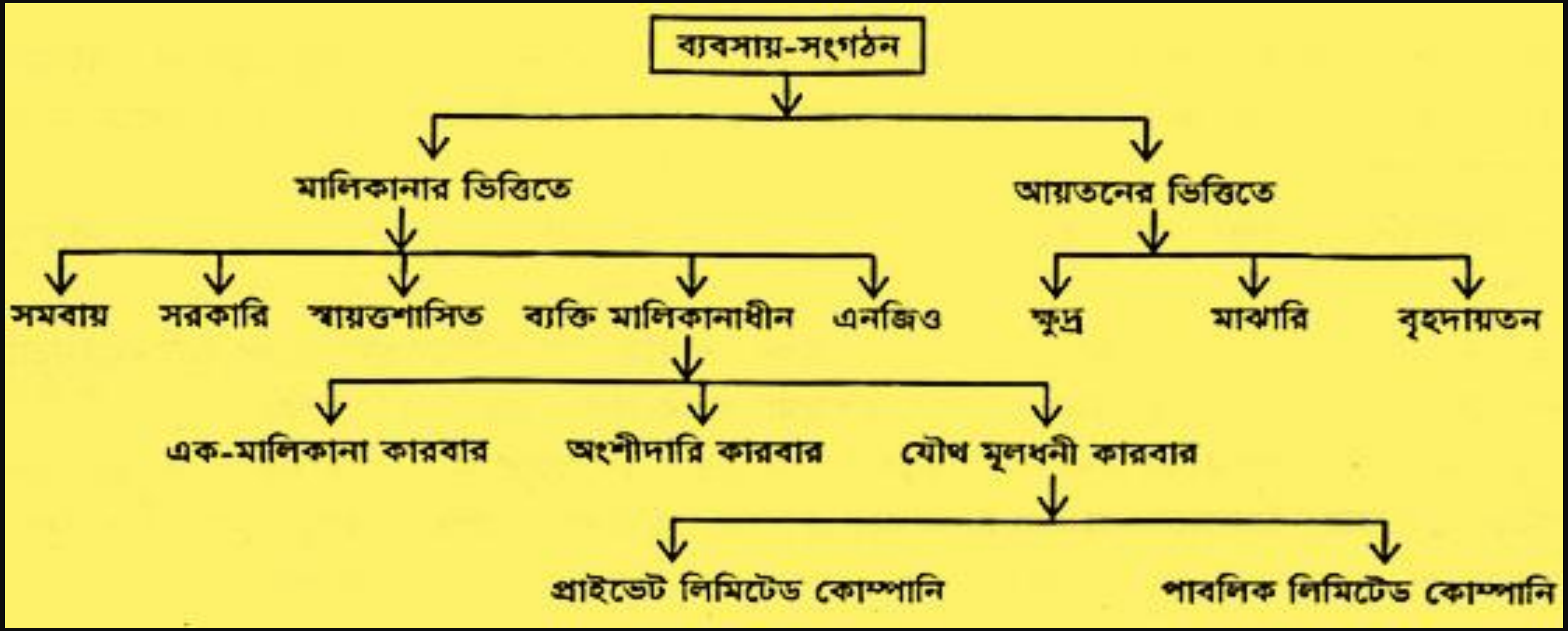

সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় কারবার

কয়েকজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমানাধিকার ও সমান দায়িত্বের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে কোনো সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, তাকে সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় কারবার বলে।

অর্থনীতিবিদ কার্লভাটের মতে, “সমবায় এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য স্বেচ্ছায় সমানাধিকারের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে।" অধ্যাপক চেম্বার্স বলেন, "পণ্যদ্রব্য সরবরাহ অথবা অন্যান্য শিল্প পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাকে সমবায় কারবার বলে।" পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমবায় সমিতিগুলো প্রতিষ্ঠিত। এখানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় কারবার

সমবায় কারবারের সুবিধা: সমবায় কারবারের সুবিধাগুলো (advantages) নিম্নরূপ:

(১) সাম্যের নীতি: সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ সাম্যের নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এখানে ছোট বড় ভেদাভেদ নেই।

(২) গণতান্ত্রিক নীতি: সমবায় প্রতিষ্ঠান অধিক গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে।

(৩) বৃহদায়তন উৎপাদন: ছোট ছোট উৎপাদকগণ সমবায়ের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে বৃহদায়তন উৎপাদন শুরু করতে পারে। এর ফলে তারা বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলো ভোগ করে ব্যয় হ্রাস করতে পারে।

(৪) মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক: সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। ফলে উৎপাদনে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

(৫) দায়িত্বশীল: কর্তব্যপরায়ণ হয়। সমবায় কারবারের সদস্যরা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের তুলনায় অধিক দায়িত্বশীল ওপায়।

(৬) সঞ্চয় বৃদ্ধি: এ কারবারের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় স্পৃহা জাগ্রত থাকে, ফলে দেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি

(৭) কাজের প্রতি আগ্রহ: যেহেতু এ কারবারের মালিক শ্রমিক সকলেই সমান সুবিধা ভোগ করে, সেহেতু কারবার সম্প্রসারণে সকলেই আন্তরিক এবং কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় কারবার

(৮) নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন: বিশ্বাস, সততা, সহযোগিতা ইত্যাদি সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। এ কারবার মানুষের চরিত্রের উন্নতি ঘটায়।

(৯) পুঁজিবাদের সমস্যা হতে মুক্ত: সমবায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক শোষণ, অধিক মুনাফা অর্জন বা আয়ের কোনো বৈষম্য নেই। ফলে শ্রেণি-শোষণ এখানে অনুপস্থিত।

(১০) দালালের উচ্ছেদ: সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের স্বার্থে দালাল, ফড়িয়া ও মধ্যস্থতাকারীদের দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটে। ফলে ভোক্তা অপেক্ষাকৃত কম দামে ঐ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে সমর্থ হয়।

(১১) অর্থনৈতিক উন্নতি: সমবায় কারবার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই দেশের দরিদ্র জনসাধারণ তাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি এ কারবারের প্রসারের ওপর নির্ভর করে।

উপরিউক্ত সুবিধার কারণে সমবায় প্রতিষ্ঠান দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় কারবার

সমবায় কারবারের অসুবিধা: সমবায় কারবারে নিম্নোক্ত অসুবিধাসমূহ দেখা দিতে পারে:

(১) মূলধনের স্বল্পতা: সাধারণত দেখা যায়, গরিব ও মধ্যবিত্তরা সমবায় কারবার গঠন করে। তাই মূলধনের স্বল্পতার কারণে তারা বৃহদায়তন শিল্পকারখানা স্থাপন করতে পারে না।

(২) শৃঙ্খলার অভাব: সমবায় প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীরা মালিক হওয়ায়, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তাদের কর্মস্পৃহা, কর্মকুশলতা হ্রাস পায়।

(৩) অদক্ষ পরিচালনা: সমবায় কারবারে যদিও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়, তবুও তাদের শিক্ষা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা স্বল্প। তাই তারা দক্ষতার সাথে কারবার পরিচালনা করতে পারে না।

(৪) মতবিরোধ: সমবায় কারবারের মূল কথা হলো পারস্পরিক সহযোগিতা। কিন্তু 'মালিক সদস্যদের' সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রে অধিক থাকে বলে 'নানা মুনির নানা মত' প্রকাশিত হয়। অনেক সময় এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

(৫) প্রেরণার অভাব: সমবায় কারবার সবার কাজ বলে কেউই সুষ্ঠুভাবে কাজ করে না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে-"Everybody's business is nobody's business". এ জন্য সমিতিতে কাজ করার প্রেরণা থাকে না। .

সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমবায় কারবার

(৬) সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব: সমবায় কারবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়, এ কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

(৭) উদ্যোগের অভাব: সমবায় কারবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজন তা সমিতির সকল সদস্যদের মধ্যে তেমন একটা দেখা যায় না।

(৮) সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্র: সমবায়ে কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকার ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সুদক্ষ ব্যক্তিরা এ কারবার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয় না।

(৯) অনিয়ম: এ কারবারে প্রায় ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়।

(১০) শিক্ষার অভাব: সমবায় সদস্যগণের মধ্যে শিক্ষার অভাব দেখা যায়। এখানে সকলে সমান যোগ্যতা সম্পন্ন নয়।

উপরিউক্ত অসুবিধার কারণে সমবায় প্রতিষ্ঠান আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে না।

সংগঠনের প্রকারভেদ

সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কিংবা জনগণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণে সরকার উদ্যোগী হয়ে সরকারি নিজস্ব মালিকানায় যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বলে। অনেক সময় সরকার ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় গ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বাংলাদেশে অস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত, কাগজ, সার শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহণ, যোগাযোগ ও সেবা খাত উল্লেখযোগ্য। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা।

সংগঠনের প্রকারভেদ

সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা: রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) অধিক মূলধন: সরকার প্রয়োজনবোধে দেশের ব্যাংকব্যবস্থা হতে, বিদেশি সরকার ও কোম্পানিগুলো হতে সহজশর্তে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

(২) ভারী-শিল্প প্রতিষ্ঠা: যেহেতু সরকার পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পারে, তাই ভারী শিল্পও সরকার স্থাপন করতে পারে।

(৩) সামাজিক অবকাঠামো: ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই এটা নির্মাণ করতে হয়।

(৪) দক্ষ পরিচালনা: সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ অতি সহজেই দক্ষ পরিচালক-কর্মচারী সংগ্রহ করতে পারে।

(৫) বৈষম্য হ্রাস: মূলধন ও সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকলে ধনবৈষম্য হ্রাস পায়। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস পায়।

(৬) প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান: কম চাহিদাসম্পন্ন অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য যা ব্যক্তি উৎপাদনে আগ্রহী থাকে না, সরকার জনকল্যাণে সেরূপ দ্রব্যের যোগান দিয়ে থাকে।

(৭) প্রতিরক্ষা শিল্প: দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

সংগঠনের প্রকারভেদ

সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

(৮) উন্নতমানের দ্রব্য: রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের সেবা-কল্যাণ সাধন। তাই এ প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। ফলে জনগণ উপকৃত হয়।

(৯) প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার: যেহেতু দেশের সকল জনগণ রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারের মালিক তাই দেশের স্বার্থে এ কারবার প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে।

(১০) বিজ্ঞাপন ব্যয়: সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়ই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। তাই বিজ্ঞাপন খরচের মতো অপচয় হতে জাতীয় সম্পদ রক্ষা পায়।

(১১) ব্যাপক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ: সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকার গবেষণা ও প্রশিক্ষণে অধিক অর্থ ব্যয় করতে পারে।

(১২) ন্যায্য মজুরি: যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়-সম্পদ, কাজেই এ কারবারে শ্রমিক শোষণের সুযোগ নেই, তারা ন্যায্য মজুরি পায়। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা: রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) আমলাতান্ত্রিক মনোভাব: সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করে। তারা রুটিনমাফিক কাজ করে বলে প্রায়ই ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

(২) উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি: সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(৩) কম উৎপাদন: যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মজুরি নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী, তাই শ্রমিকরা অধিক উৎপাদনের জন্য কোনোরূপ আগ্রহ ব্যক্ত করে না। ফলে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবে উৎপাদন হ্রাস পায়।

(৪) দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি: সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির সততা, কর্মকুশলতা, দক্ষতা ইত্যাদির পরিবর্তে স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক প্রভাব, তোষণের ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি ইত্যাদি অনিয়মে আক্রান্ত।

(৫) দক্ষতার অভাব: সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে পদোন্নতি দক্ষতার ভিত্তিতে হয় না, চাকরির জ্যেষ্ঠতা বয়সের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফলে কর্মচারীরা দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেখায় না।

(৬) অপচয়: সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও মেরামতের অভাবে কলকজা, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র অধিক অপচয় হয়।

(৭) ব্যবসায়ের নীতির পরিবর্তন: সরকারি কর্মচারীদের বদলি ও সরকারের পরিবর্তনের ফলে অনেক সময় ব্যবসায়ের নীতির পরিবর্তন ঘটে, ফলে সাফল্য ব্যাহত হয়।

সংগঠনের প্রকারভেদ

সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

(৮) গোপনীয়তা অনিশ্চিত: সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। এ প্রতিষ্ঠান যেহেতু রাষ্ট্রের সম্পত্তি তাই এর গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন।

(৯) প্রতিযোগিতা থাকে না: সরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রতিযোগিতা থাকে না। ফলে এরূপ কারবার প্রায়ই উদ্যমহীন হয়ে পড়ে।

(১০) কর্মতৎপরতার অভাব: সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজ বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেঁয়েমিপূর্ণ, গতানুগতিক কাজ। তাই কর্মচারীদের মাঝে কর্মস্পৃহা ও কর্মতৎপরতা হ্রাস পায়।

উল্লিখিত অসুবিধার কারণে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যাশিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। যেসব প্রতিষ্ঠান দেশের আইন পরিষদের বিশেষ আইনের মাধ্যমে সরকারি নীতি ও আদর্শের আওতায় একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বলে। এরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ব্যক্তিমালিকানার সুবিধা ভোগ করা যায় তেমনি অন্যদিকে সরকারি আনুকূল্যও লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে সরকার সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় না। সরকারি প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দুর্বলতা এড়ানো এবং প্রশাসনে গতিশীলতা সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়।

সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের অধিকাংশ বৃহদায়তন খাতসমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। যেমন:

(i) শিল্প উৎপাদন খাতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা, বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ইত্যাদি।

(ii) খনিজ সম্পদ খাতে: বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি।

(iii) কৃষিখাতে: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ইত্যাদি।

(iv) পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ইত্যাদি।

(v) সেবাখাতে: বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড ইত্যাদি। সারটি।

সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা: এরূপ প্রতিষ্ঠানের সুবিধাসমূহ হলো: (i) প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, (ii) দক্ষতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ, (iii) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কম, (iv) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি কম, তাই কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, (v) এটি গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

অসুবিধা: যদি এরূপ প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব বা হস্তক্ষেপ পড়ে, সেক্ষেত্রে-
(i) ক্ষমতার অপব্যবহার হয়, (ii) অদক্ষ পরিচালক বা কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হন, (iii) প্রতিষ্ঠানের নীতিমালার পরিবর্তন ঘটে এবং (iv) প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উৎপাদন, বণ্টন ও সেবা প্রদানে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

যেসব প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলা হয়। এরূপ মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) একমালিকানা কারবার, (খ) অংশীদারি কারবার ও (গ) যৌথমূলধনী কারবার।
এখন এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

একমালিকানা কারবার

ব্যবসায়ের অতি প্রাচীন রূপ হলো একমালিকানা কারবার। শিল্প বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকেই এ কারবার প্রচলিত। যে কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকে, মালিক নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে এবং এর লাভ-লোকসানের জন্যও তিনি দায়ী থাকেন, তাকে একমালিকানা কারবার বলা হয়। অধ্যাপক বি.ও. হুইলার (B.O. Wheeler) বলেন, "একমালিকানা ঐ ধরনের ব্যবসায় মালিকানা যা মাত্র এক ব্যক্তির মালিকানায় এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" (The sole proprietorship is the form of business ownership which is owned and controlled by a single individual.)

অধ্যাপক এম. সি. শুকলা এ সম্পর্কে বলেন, "একমালিকানা কারবার এরূপ একটি সংগঠন যেখানে কারবারের সকল ঝুঁকি গ্রহণ করে উদ্যোক্তা স্বাধীনভাবে তার পুঁজি, দক্ষতা এবং বুদ্ধি খাটিয়ে উৎপাদনের মাধ্যমে সমুদয় মুনাফার মালিক হয়।"

অতএব, একমালিকানা কারবার সম্পর্কে বলা যায়, একমালিকানা কারবার এরূপ সংগঠন যেখানে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার পুঁজি, বুদ্ধি এবং দক্ষতার মাধ্যমে উৎপাদন করে সম্পূর্ণ মুনাফার অধিকারী হয় এবং সকল ঝুঁকিও গ্রহণ করে।

একমালিকানা কারবার

একমালিকানা কারবারের সুবিধা: একমালিকানা কারবারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

১. গঠনের সুবিধা: একমালিকানা কারবার সহজে গঠন করা যায়। আইনের বিধি-নিষেধ না থাকায় যেকোনো সংগঠক ইচ্ছা করলেই এ ধরনের কারবার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

২. দক্ষ পরিচালনা: একমালিকানা কারবারে মালিক নিজেই আগ্রহসহকারে ব্যবসায়ের কার্যকলাপ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করে। তিনি সকল প্রকার অপচয় রোধ করতে সচেষ্ট থাকেন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে অধিক যত্ন নিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

৩. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: এরূপ কারবারে মালিক ও পরিচালক একই ব্যক্তি তাই যেকোনো ব্যাপারে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

৪. অধিক যত্ন: একমালিকানা কারবারে যেহেতু লাভ-লোকসানের ঝুঁকি মালিককে বহন করতে হয়, তাই মালিক অধিক যত্নসহকারে কারবার পরিচালনার কাজে সচেষ্ট হয়। ফলে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নত হয়।

একমালিকানা কারবার

৫. স্বল্প মূলধন : একমালিকানা কারবার সাধারণত ক্ষুদ্র আয়তনের হয়। ফলে স্বল্প মূলধন দ্বারাই এ কারবার গঠন করা যায়।

৬. ক্রেতার রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন: একমালিকানা কারবার সাধারণত ক্ষুদ্র আয়তনের হয়। এ কারবারের উৎপাদনকারী বাজারের অবস্থা, ভোক্তাদের চাহিদা, রুচি প্রভৃতি মূল্যায়ন করে পণ্য উৎপাদন করে। ফলে ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

৭. কম অপচয়: একমালিকানা কারবারের মালিক নিজেই যেহেতু ব্যক্তিগত তদারকিতে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে তাই কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর অপচয় কম হয়।

একমালিকানা কারবার

৮. হিসাবরক্ষণের সুবিধা: একমালিকানা কারবারে যেহেতু হিসাবরক্ষণের আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তাই মালিক সুবিধামতো যেকোনো পদ্ধতিতে হিসাব রাখতে পারে।

৯. মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ভালো: এ কারবারে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করেন বলে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

১০. গোপনীয়তা: একমালিকানা কারবারে মালিক নিজেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে বলে ব্যবসায়ের সফলতা গোপন রাখতে পারে। এতে ব্যবসায়ের গোপন তথ্য কেউ জানতে পারে না।

১১. বিলোপ সাধন: একমালিকানা কারবারের বিলোপ সাধনের জন্য সরকারের কোনো পূর্ব অনুমতি গ্রহণ বা আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না।

১২. উৎসাহ-উদ্দীপনা: একমালিকানা কারবারে ব্যবসায়ের সকল মুনাফা মালিক ভোগ করে। ফলে ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য যে উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আন্তরিকতা প্রয়োজন তা মালিকের বিদ্যমান থাকে।

১৩. সামাজিক মর্যাদা: একমালিকানা কারবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হলে, উদ্যোক্তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

একমালিকানা কারবার

একমালিকানা কারবারের অসুবিধা: একমালিকানা কারবারের যথেষ্ট সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর কতগুলো অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে এ কারবারের অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. মূলধনের স্বল্পতা: একমালিকানা কারবারের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব। ফলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা হতে মালিক বঞ্চিত থাকে।

২. ঝুঁকির আধিক্য: একমালিকানা কারবারের অন্যতম অসুবিধা এই যে, যেকোনো একজনের পক্ষে সব ঝুঁকি গ্রহণ খুবই বিপজ্জনক। এরূপ কারবারে ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হলে তাকে একেবারে দেউলিয়া হতে হয়।

৩. ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন: একমালিকানা কারবার আয়তনে ছোট, তাই বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে না।

৪. সীমাহীন দায়িত্ব: এ কারবারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মালিককে এককভাবে বহন করতে হয়। এর ফলে মালিক ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদন কাজে মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

সংগঠনের প্রকারভেদ

একমালিকানা কারবার

৫. উৎপাদন ব্যয় অধিক: একমালিকানা কারবারের আয়তন ক্ষুদ্রাকার হয় বিধায় উৎপাদন ব্যয় অধিক হয়। কারণ এ ধরনের কর্ম অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করে না।

৬. দক্ষতা হ্রাস: ব্যক্তিবিশেষ যত প্রতিভাশীলই হোক না কেন তার কর্মদক্ষতা ও জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ কারণে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পেলে শুধু একা মালিকের পক্ষে কারবারের সকল বিষয় সমান দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

৬. দক্ষতা হ্রাস: ব্যক্তিবিশেষ যত প্রতিভাশীলই হোক না কেন তার কর্মদক্ষতা ও জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ কারণে কারবারের আয়তন বৃদ্ধি পেলে শুধু একা মালিকের পক্ষে কারবারের সকল বিষয় সমান দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

৭. স্বল্প অস্তিত্ব: একমালিকানা কারবারের মালিকের মৃত্যুতে বা প্রতিকূল অবস্থার কারণে এর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব স্বল্প সময়ের জন্য হয়। মালিকের অনুপস্থিতিতে যদি তা অযোগ্য উত্তরাধিকারের হাতে পড়ে, তাহলে কারবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

একমালিকানা কারবার

৮. দক্ষ কর্মচারীর অভাব: একমালিকানা কারবারে মূলধনের পরিমাণ কম, তাই দক্ষ কর্মচারীর অভাবে এ কারবার প্রায় সঠিকভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে না।

৯. প্রতিযোগিতার মনোভাবহীন: যেহেতু এ কারবার মূলধনের অভাবে স্বল্প আয়তনে উৎপাদন করে, তাই বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রায়ই অক্ষম থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, একমালিকানা কারবারের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরও এর বিশেষ কিছু সুবিধার জন্য বর্তমান যুগে এটি ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে।

সংগঠনের প্রকারভেদ

অংশীদারি কারবার

যে কারবারে পরস্পরের সাথে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাকে অংশীদারি কারবার বলা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারানুযায়ী বলা যায়, সকলের দ্বারা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যকার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ককে অংশীদারি কারবার বলে। ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন ব্যক্তি এ কারবারের সদস্য হতে পারে। ব্যাংকিং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন সদস্য থাকতে পারে। এ কারবারে সকলের সমান অংশীদার হবার প্রয়োজন নেই, তবে অংশীদারগণ একক এবং যৌথভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য এবং ব্যবসায়ের ঋণের জন্য দায়ী থাকে। এ ধরনের কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

অংশীদারি কারবারে ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন ব্যক্তি সদস্য হতে পারে। পারস্পরিক বিশ্বাস এ কারবারের ভিত্তি। অংশীদারগণ সকলেই যুক্তভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং এদের দায়িত্ব অসীম। অংশীদারগণের মধ্যে কেউ পাগল বা দেউলিয়া হয়ে গেলে, কেউ মারা গেলে এ ধরনের কারবার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এর স্থায়িত্ব খুব কম হয়। উল্লেখ্য যে, অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের কারবার পরিচালিত হয়।

অংশীদারি কারবার

অংশীদারি কারবারের সুবিধা: অংশীদারি কারবারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

১. সহজে গঠন: দু' বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে কারবার গঠন করতে রাজি হলেই অংশীদারি কারবার গঠন করা যায়। তাই এ কারবারের গঠনপ্রণালি খুব সহজ।

২. পর্যাপ্ত মূলধন : অংশীদারি কারবারের সকল অংশীদারগণ মূলধনের যোগান দেয়, তাই এ কারবারে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

৩. অসীম দায়িত্ব: এ কারবারের অংশীদারগণ একা ও সম্মিলিতভাবে ব্যবসায়ের অসীম দায়ভার বহন করে। ফলে বাজার থেকে সহজে ঋণ পাওয়া যায়।

৪. শ্রমবিভাগের সুষম বণ্টন: এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সমাবেশ ঘটতে পারে। ফলে তাদের দক্ষতানুযায়ী ব্যবসায়ের কাজ বণ্টন করে দেয়া যায়।

৫. সুষ্ঠু পরিচালনা: যেহেতু কারবারের সকল অংশীদারকে লাভ-লোকসানের ভাগ বহন করতে হয়, তাই সকল অংশীদারদের কারবারের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে অধিক যত্নবান হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

৬. করের সুবিধা: একক মালিকানা কারবার অপেক্ষা অংশীদারি কারবারে আয়কর ও অন্যান্য করের ব্যাপারে কিছু বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়।

অংশীদারি কারবার

৭. গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত: অংশীদারগণের আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ কারবারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে তা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হয়।

৮. দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ: এ কারবারে যেহেতু মূলধনের পরিমাণ অধিক হয়, তাই এ কারবারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা যায়।

৯. মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক: এ ধরনের কারবারে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে খুব সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এ ছাড়া অংশীদারগণের সাথে ভোক্তাদেরও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১০. ব্যবসায়ের সুনাম ও দক্ষতা: এ ধরনের কারবারে প্রত্যেক অংশীদারগণ তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করে। ফলে ব্যবসায়ের সুনাম ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অধিক মুনাফা অর্জনের পথ সুগম হয়।

১১. স্থিতিস্থাপকতা: অংশীদারি কারবারে প্রয়োজনে অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। ব্যবসায় সম্প্রসারণের সময় এ সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

সংগঠনের প্রকারভেদ

অংশীদারি কারবার

অংশীদারি কারবারের অসুবিধা: অংশীদারি কারবারের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

১. অসীম দায়িত্ব: অংশীদারি কারবারের অংশীদারগণের অসীম দায়িত্ব এ ব্যবসায়ের প্রধান অসুবিধা। ব্যবসায়ে লোকসান হলে ঋণদাতা যেকোনো অংশীদারের কাছ থেকে ঋণের সমস্তটাই আইনগতভাবে আদায় করতে পারে।

২. স্থায়িত্ব কম: অংশীদারি কারবারের স্থায়িত্ব খুবই কম। কোনো অংশীদার মারা গেলে, পাগল বা দেউলিয়া হলে আইনগতভাবে কারবার বন্ধ হয়ে যায়।

৩. মতবিরোধ: এ কারবারের অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসাসংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে ব্যবসায়ের ক্ষতিসাধন হয়। এর ফলে অনেক সময় ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৪. অপ্রচুর মূলধন: অংশীদারি কারবারে যদিও একমালিকানা কারবারের তুলনায় বেশি মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব, তথাপিও বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধনের তুলনায় তা অপর্যাপ্ত।

৫. অদক্ষ অংশীদার এ কারবারের সবাই যোগ্যতাসম্পন্ন হয় না। ২/১ জন অদক্ষ অংশীদার থাকলে এর ফলে অন্য সবাইকে ভোগান্তি পোহাতে হয়।

অংশীদারি কারবার

৬. পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব অনেক সময় অংশীদারদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার অভাব দেখা যায়।

৭. শেয়ার হস্তান্তরে জটিলতা: এ কারবারের অংশ, শেয়ার ও স্বার্থ হস্তান্তর করতে হলে সকল অংশীদারের সম্মতির প্রয়োজন হয়-যা অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করে।

৮. সীমিত সদস্য সংখ্যা: এ কারবারের সদস্য সংখ্যার একটি সর্বোচ্চ সীমা আছে। এর বেশি সদস্য নিয়ে কারবার সম্প্রসারণ করা যায় না।

৯. জনগণের আস্থা কম আইনের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় এ ধরনের কারবারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা খুব কম থাকে।

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ওপরের অসুবিধাগুলো এ কারবারের সাথে জড়িয়ে আছে। তাই বর্তমানে অংশীদারি কারবারের স্থান "সৌথমূলধনী কারবার" দখল করেছে।

সংগঠনের প্রকারভেদ

যৌথমূলধনী কারবার

বর্তমানকাল বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগ। ১৭ শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম এ কারবার চালু হয়। তবে বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব দেশেই যৌথমূলধনী কারবারের প্রচলন রয়েছে।

অধ্যাপক থমাসের মতে, "যৌথমূলধনী কারবার এরূপ একটি কারবার যা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির যৌথ প্রতিষ্ঠান, যেখানে তারা কোনো কারবার করে তার লাভ-লোকসান ভাগ করার জন্য যৌথভাবে সাধারণ তহবিলে অর্থ প্রদান করে।"

অতএব, যৌথমূলধনী কারবার বলতে বহুসংখ্যক ব্যক্তির যৌথমালিকানায় গঠিত কারবার প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। যৌথমূলধনী কারবার গঠনপ্রণালি: কারবারের উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির নাম, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি সংক্রান্ত স্মারকলিপি (article of memorandum) জনগণের উদ্দেশে প্রচার করে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবসায়ের কাজ শুরু করে। এ কারবার প্রধানত দু'প্রকার হয়ে থাকে। যথা- (i) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং (ii) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা ২ জনের কম এবং ৫০ জনের বেশি হতে পারে না এবং তাদের শেয়ারের মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে না।

অন্যদিকে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা ৭ জন থেকে অসংখ্য এবং তাদের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।

যৌথমূলধনী কারবার

মূলধন সংগ্রহ: যৌথমূলধনী কারবার সব সময় অনুমোদিত মূলধনের সবটুকু শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে না। অনুমোদিত মূলধনের যে পরিমাণ শেয়ার বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রচার করা হয় তাকে ইস্যুকৃত মূলধন (Subscribed Capital) এবং বিক্রীত মূলধনের যে অংশ শেয়ার ক্রেতাদের থেকে নগদে আদায় করা হয় তাকে আদায়কৃত মূলধন (Paid up capital) বলে। যৌথমূলধনী কারবার নিম্নোক্ত উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে : (i) শেয়ার বিক্রি করে, (ii) ঋণপত্র (Debenture) বিক্রি করে, (iii) ঋণ গ্রহণ করে, (iv) জনগণের অর্থ গচ্ছিত রেখে এবং (v) সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করে।

যৌথমূলধনী কারবার

যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধা: যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ
: ১. পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ: যৌথমূলধনী কারবার অতি সহজে শেয়ার, ঋণপত্র বিক্রি করে, ঋণ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।
২. বৃহদায়তন উৎপাদন: এ কারবার যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে, সেই কারণে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়। ফলে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে।
৩. প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয়: সমাজে এমন অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি আছে, যাদের ব্যবসায়িক আকাঙ্ক্ষা বা কর্মকুশলতা নেই। অপরদিকে, ব্যবসায়ের বুদ্ধিসম্পন্ন অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তি আছে যাদের প্রয়োজনীয় মূলধন নেই। যৌথমূলধনী কারবার এ দু শ্রেণির লোকের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করে উভয়ের যৌথ প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

যৌথমূলধনী কারবার

৪. স্থায়িত্ব: একমালিকানা বা অংশীদারি কারবারে কারো মৃত্যু হলে বা পাগল হয়ে গেলে যেরূপ ব্যবসায় অচল হয়ে পড়ে, যৌথমূলধনী কারবারে এরূপ কোনো ক্ষতি হয় না। এখানে পুরাতন অংশীদারগণ শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে যেমন কারবার ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে।

৫.সীমাবদ্ধ দায়: যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারকে তার শেয়ারের সমান অনুপাতে দায় গ্রহণ করতে হয়।

৬. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ: স্বল্প পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে এ কারবারের লভ্যাংশ পাওয়া যায় বলে অধিক সংখ্যক লোক এ কারবারে তাদের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করে এবং এ জন্য মানুষ সঞ্চয়ে আকৃষ্ট হয়।

৭. শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য: যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য। বিনিয়োগকারী ইচ্ছা করলে তার শেয়ার বিক্রি করে টাকা ফেরত নিতে পারে অথবা নতুন আরো শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

৮.ঝুঁকি বণ্টন : এ কারবারের ঝুঁকি বহু সংখ্যক অংশীদার বহন করে। ফলে প্রত্যেক অংশীদারের ঝুঁকি কম হয়।

যৌথমূলধনী কারবার

৯. সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালনা: এ কারবারে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালকগণের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনে পুরাতন পরিচালক পরিবর্তন করে নতুন পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নিয়োগ করা যায়। তবে এ সকল ক্ষেত্রে কঠোরভাবে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়।

১০. লোকের আস্থা: যৌথমূলধনী কারবার আইন মোতাবেক গঠিত ও পরিচালিত হয়। তাই এ ধরনের কারবারের ওপর লোকের পূর্ণ আস্থা থাকে।

১১. উন্নত কলাকৌশলের প্রয়োগ: যেহেতু যৌথমূলধনী কারবারে মূলধনের কোনো সমস্যা নেই-তাই এ কারবারে দক্ষ কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ করে থাকে।

১২. সম্প্রসারিত বাজার: যৌথমূলধনী কারবারে যেহেতু উৎপাদন ব্যয় কম হয়, ফলে দ্রব্যমূল্যও কম হয় এবং দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বাজার সম্প্রসারিত হয়।

যৌথমূলধনী কারবার

যৌথমূলধনী কারবারের অসুবিধা: যৌথমূলধনী কারবারের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

১. দক্ষ পরিচালনার অভাব: বেতনভোগী কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক যৌথমূলধনী কারবারের কার্যক্রম সম্পাদিত হওয়ায় তারা সব সময় সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে না।

২. অগণতান্ত্রিক পরিচালনা: যৌথমূলধনী কারবারের কাজ-কর্ম দেখাশোনা ও পরিচালনার দায়িত্ব বেতনভোগী কর্মকর্তা কর্মচারীরা পালন করলেও আসলেই বেশি শেয়ারের মালিকেরাই ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। ফলে কার্যক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিই এখানে অনুসরণ করা হয়।

৩. অংশীদার ও পরিচালকদের মধ্যে সংযোগের অভাব: এ কারবারের শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা অগনিত এবং তাদের অংশগুলো হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় কারবার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতদের সাথে অংশীদারদের কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকে না।

৪. সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অপচয়: যেহেতু বেতনভুক্ত কর্মচারীরা এ কারবারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনার দায়িত্বে থাকে, তাদের সততা ও আন্তরিকতার অভাবে কারবারের অনেক অপচয় হয়ে থাকে।

৫. সংগঠন জটিলতা: এ ধরনের কারবারে গঠনপ্রণালি খুবই জটিল। অনেক আইনগত সমস্যায় পড়তে হয় বলে সাধারণ লোক শেয়ারহোল্ডার হতে আগ্রহী নয়।

৬. শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ভালো নয়: যৌথমূলধনী কারবারে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সব সময় ভালো থাকে না। উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে ধর্মঘট, লক আউট, শ্রমিক সংঘর্ষ প্রায় লেগেই থাকে।

যৌথমূলধনী কারবার

৭. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ: এ ধরনের কারবারের কতিপয় শেয়ারহোল্ডার বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন নামে মোট শেয়ারের বৃহৎ অংশের মালিকানা অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক হয়ে ওঠে ও নিজেদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে।

৮. শেয়ারের ফটকা ব্যবসায় যেহেতু এ কারবারের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য তাই কোনো প্রতিষ্ঠানের লাভের সংবাদে অসাধু ও চতুর লোক শেয়ারবাজারে ফটকা ব্যবসায়ে জেঁকে বসে, যখন লোকসানের আভাস পায় তখন জনসাধারণকে লোভ দেখিয়ে তাদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে।

৯. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি: এ কারবারের পরিচালকরা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বিভিন্ন কাজে যোগ্যতা ছাড়াই নিযুক্ত করে। এর ফলে ব্যবসায়ের মুনাফা হ্রাস পায় বা ব্যবসায় ধ্বংস হয়ে যায়।

যৌথমূলধনী কারবার

১০. ধনবৈষম্য: যৌথমূলধনী কারবারের মাধ্যমে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় ও ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

১১. ক্ষতির সম্ভাবনা: এ ধরনের কারবারে অনেক সময় বিনিয়োগকারিগণ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসাধু ও অযোগ্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১২. মতানৈক্য: এ কারবারে অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে মতানৈক্যের ফলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উপসংহারে বলা যায়, এ সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধা অনেক বেশি। তাই বর্তমানে এ ধরনের ব্যবসায়ই অধিক গড়ে ওঠছে এবং এদের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৭ : সংগঠন

টপিক – ০৩ এনজিও

এনজিও

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

এনজিও

এনজিও (Non Government Organization) হচ্ছে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৫ সালে United Nations প্রতিষ্ঠার পরপরই আন্তঃসরকারের সংগঠন হিসেবে NGO এর যাত্রা শুরু হয়।

UN এর মতে, যেকোনো বেসরকারি সংগঠন যা সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে মুনাফাবিহীন, সন্ত্রাসবিহীনভাবে অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে NGO বলে। ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বলা যায়-NGO বলতে এরূপ এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নির্দেশ করে যা জনগণের চাঁদা ও সাহায্যে এবং সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণমূলক সেবাকর্ম পরিচালনার উদ্দেশে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মতৎপরতা পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে তেমন লক্ষ্যণীয় ছিল না। ঐ সময়ে মাত্র কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ক্যাথলিক ও ব্যাপটিস্ট মিশনারি, কেয়ার, গতানুগতিকভাবে প্রধানত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করে আসছিল। ১৯৭০ সালের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণ, ওষুধ, স্বাস্থ্যসেবা ও আশ্রয়জনিত পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত হয় বেশ কিছু সংখ্যক দেশি ও বিদেশি এনজিও।

১৯৮০ সালের পর হতে এনজিও'র সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওরা বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে।

এনজিও

বাংলাদেশে প্রধান প্রধান এনজিও

ব্র্যাক: দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা। ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্যবিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। বিশেষত সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষ যেমন, অতিদরিদ্র চরবাসী, দুস্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাঁটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আশা: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠিত হয়। আশা বর্তমানে সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আশার ইনোভেটিভ স্বল্পব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রশিকা : ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে।

টিএমএসএস (TMSS): কর্মক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এনজিও

ব্যুরো বাংলাদেশ: ১৯৯০ সালে টাংগাইল জেলায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ৬৪ জেলায় ৪০৬টি উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস SSS): সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্যবিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে এসএসএস (SSS) আত্মপ্রকাশ করে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ: ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি সেল হিসেবে কাজ শুরু করলেও ১৯৮৫ সাল থেকে নিবন্ধিত NGO হিসেবে কতিপয় সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

এনজিও

সামগ্রিক কর্মক্ষেত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহ বহুমুখী উন্নয়নধর্মী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত বছরগুলোতে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (i) সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন, (ii) পরিবার পরিকল্পনা, (iii) আয়বর্ধনমূলক, (iv) স্বাস্থ্য, (v) জনস্বাস্থ্য, (vi) মহিলা উন্নয়ন, (vii) আইনি সহায়তা, (viii) শিশু মঙ্গল, (ix) শিশু সদন, (x) শিক্ষা, (xi) বয়স্ক শিক্ষা, (xii) ত্রাণ ও পুনর্বাসন, (xiii) উদ্বুদ্ধকরণ, (xiv) পল্লি ও শহর উন্নয়ন, (xv) অবকাঠামো নির্মাণ, (xvi) কৃষি উপকরণ সরবরাহ, (xvii) মৎস্য ও পশুপালন, (xviii) বন ও পরিবেশ, (xix) যুব উন্নয়ন ও (xx) অন্যান্য।

এনজিও

দাতা সংস্থা

প্রায় ৯০টি দাতা সংস্থা এদেশে এনজিওদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। দাতা সংস্থার মধ্যে হলো: WB; EU, USAID, GERMAN GOVT, CIDA, FORD FOUNDATION, PATH FINDER, ADB, JICA, ASIA FOUNDATION, NORAD, PACT উল্লেখযোগ্য।

সংগঠন হিসেবে এনজিও'র ভূমিকা/Role of NGO as an Organization

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও BRAC। বাংলাদেশের একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে BRAC বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। পৃথিবীর বহু দেশে BRAC এবং গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্যবিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান NGO সমূহ হলো:

ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, শক্তি ফাউন্ডেশন, টিএমএসএস, সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস), স্বনির্ভর বাংলাদেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে যে কয়েকটি সেক্টরে এনজিওরা সফল ও প্রশংসিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (i) প্রাথমিক শিক্ষা, (ii) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, (iii) পরিবার পরিকল্পনা, (iv) ওয়াটার ও সেনিটেশন, (v) সামাজিক বনায়ন, (vi) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, (vii) নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি, (viii) ইপিআই কর্মসূচি, (ix) ত্রাণ ও পুনবার্সন, (x) গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রসার, (xi) বেকারত্ব দূরীকরণ, (xii) দুর্যোগ মোকাবেলা, (xiii) রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, (xiv) প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, (xv) কৃষি উন্নয়ন, (xvi) এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ, (xvii) মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ, (xviii) নিরাপদ সড়ক, (xix) আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, (xx) পরিবেশ সংরক্ষণ, (xxi) আইসিটি এবং (xxi) দারিদ্র্যবিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ।

এনজিও

জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে NGO এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর পরোক্ষ ফল হলো সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে শ্রীলংকার পর একমাত্র বাংলাদেশই সক্ষম হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের কাতারভুক্ত বাংলাদেশের মতো মাথাপিছু আয় রয়েছে এমন অন্য কোনো দেশ এ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এছাড়া দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো (NGO) তাদের ঋণ দান কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮৯২টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়েছে। এসব এনজিওসমূহ ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণি, বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কোটি কোটি মানুষ এ সুবিধা ভোগ করে দারিদ্র্যবিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ৭৩৭টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান দেশের ৪ কোটির অধিক গ্রাহকের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।*

এর বাইরে কোনো কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে অতিদরিদ্র (Ultra-poor) দের জন্য ০-৫ শতাংশ হারে (সার্ভিস চার্জ) ঋণ প্রদান কার্যক্রম। এছাড়া দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি থেকে ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধা দেয়ার জন্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের রয়েছে কিস্তি মওকুফসহ বিশেষ ঋণ প্রদান কার্যক্রম।
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় জনগণকে সচেতন করা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণেও এনজিওদের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৭ : সংগঠন

টপিক – ০৪ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. উৎপাদনের উপাদানগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় সাধনের কাজ যে করে তাকে কী বলে? [সি. বো. '১৬]

(ক) ভোক্তা (খ) সংগঠন (গ) উৎপাদক (ঘ) সংগঠক

২. উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর যেমন-উপকরণ, ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের কাজকে কী বলে?[কু. বো. '১৭; দি. বো. '১৭]

(ক) সংগঠক (খ) সংগঠন

(গ) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (ঘ) অংশীদারি কারবার

৩. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে?[ঢা. বো. '১৯]

(ক) ভূমি (খ) শ্রম (গ) সংগঠন (ঘ) মূলধন

৪. অংশীদারি কারবারে কীভাবে মূলধন সংগ্রহ করা হয়? [চ. বো. '১৯]

(ক) যৌথভাবে পুঁজি সরবরাহ করে (খ) ব্যাংক থেকে ঋণপত্র বিক্রয় করে

(গ) শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করে (ঘ) সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করে

৫. যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ারহোল্ডারদের দায়-[রা. বো. '১৯]

(ক) সীমাবদ্ধ থাকে (খ) অসীম থাকে (গ) সমান থাকে (ঘ) ঝুঁকিহীন থাকে

৬. অংশীদারি কারবারে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত? [সি. বো. '১৮]

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৭. ফরাসি শব্দ 'Enterprendre' এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো- [আলিম '১৯]

(ক) সংগঠক (খ) সংগঠন (গ) ব্যবস্থাপক (ঘ) মহা-ব্যবস্থাপক

৮. সংগঠনের মূল লক্ষ্য কী? [য. বো. '১৬]

(ক) মুনাফা অর্জন করা (খ) মূলধন গঠন করা

(গ) নীতিমালা তৈরি করা (ঘ) চাহিদা বাড়ানো

৯. সংগঠক/উদ্যোক্তাকে কে 'Captain of the industry' 'কারবারের কর্তা' বা 'শিল্পাধিনায়ক' বলেছেন? [চ. বো. '১৬, '১৭; দি. বো. '১৬; ঢা. বো. '১৯]

(ক) অ্যাডাম স্মিথ (খ) এল. রবিন্স (গ) জে. এস. মিল (ঘ) মার্শাল

১০. অংশীদারি কারবারে কতজন সদস্য থাকে? [রা. বো. '১৬; ঢা. বো. '১৭; আলিম '১৮)

(ক) ২ থেকে অসংখ্য (খ) ২ থেকে ৫০ জন

(গ) ২ জন থেকে ৩০ জন (ঘ) ২ থেকে ২০ জন

১১. অংশীদারি কারবারে সর্বাধিক কতজন সদস্য হতে পারে? [রা. বো. '১৬]
(ক) ১৫ (খ) ২০ (গ) ২৫ (ঘ) ৩০
১২. আধুনিক শিল্পের অধিনায়ক কে?বা, 'Captain in the field of Production' বলা হয়-[আলিম '১৭, '১৯]
(ক) উদ্যোক্তা/সংগঠককে (খ) ভূমি (গ) শ্রমিক (ঘ) মূলধন
১৩. কোন কারবারের সংক্ষিপ্ত নাম 'কোম্পানি'? [রা. বো. '১৭]
(ক) অংশীদারি কারবার (খ) যৌথমূলধনী কারবার
(গ) একক মালিকানা কারবার (ঘ) বহু মালিকানা কারবার
১৪. কোন প্রতিষ্ঠান জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে? [কু. বো. '১৬; আলিম ‘১৯]
(ক) প্রাইভেট লি. কোম্পানি (খ) পাবলিক লি. কোম্পানি
(গ) অংশীদারি কারবার (ঘ) সমবায় কারবার
১৫. একমালিকানা ব্যবসায় সীমিত আয়তনের হয় কেন?
(ক) স্বল্প পুঁজি ও একক সামর্থ্যের জন্য (খ) একক মুনাফা ভোগ করায়
(গ) প্রত্যক্ষ সম্পর্কের জন্য (ঘ) অনিশ্চিত স্থায়িত্বের জন্য

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৭ : সংগঠন

টপিক – ০৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. 'X'-এর একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপকরণ সংগ্রহ ও এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা পেলেও তাঁকে অনেক বেশি ঝুঁকি বহন করতে হয়। [কু. বো. '১৯]

(ক) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কাকে বলে?

(খ) "দারিদ্র্যবিমোচনে NGO সহায়ক ভূমিকা পালন করে"-ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকে কার অর্থনৈতিক কার্যাবলির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

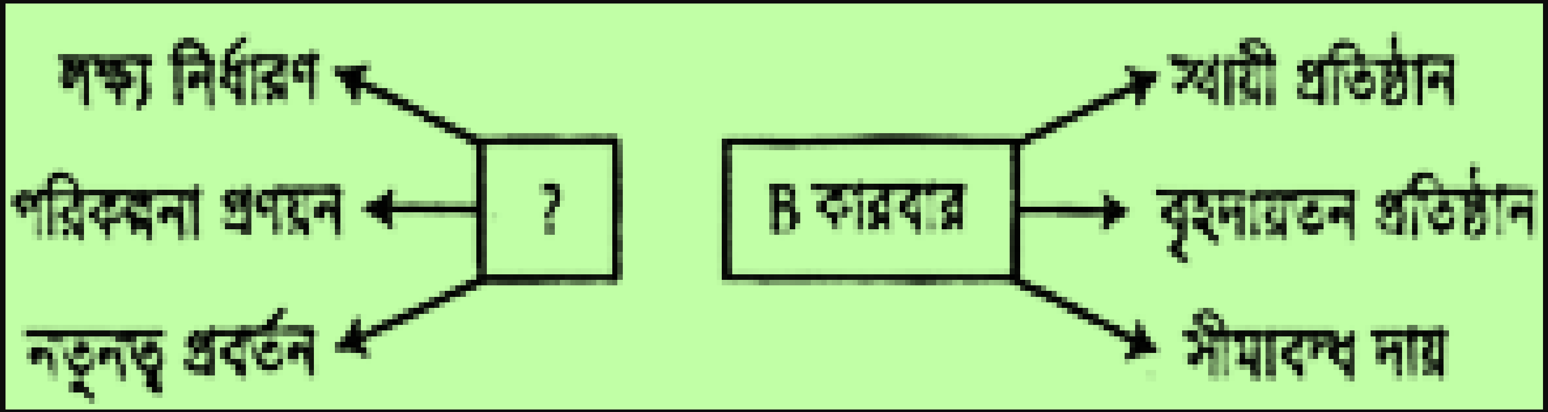

[য.বো.১৯]
(ক) সংগঠনকে "Captain of the Industry" কে বলেছেন?
(খ) NGO বলতে কী বুঝ?
(গ) উদ্দীপকের? চিহ্নিত স্থানে যা বসবে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) উদ্দীপকে "B" কারবারটি কী ধরনের কারবার? এর সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করো।

'M' ফার্মাসিউটিক্যালস-এর সদস্য সংখ্যা অসংখ্য। কোম্পানির আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি জনগণের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহ করে এবং শেয়ারহোল্ডারদেরকে বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারও হস্তান্তরযোগ্য। অন্যদিকে 'N' কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা ১০ জন। তাঁরা যৌথভাবে মূলধনের যোগান দেয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তবে একজন শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। [সি. বো. '১৯]

(ক) 'BRAC'-এর পূর্ণরূপ লেখ।

(খ) সমবায় কারবার কোন অর্থে একমালিকানা কারবার অপেক্ষা উন্নত?

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' কোম্পানি কোন ধরনের সংগঠন?

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে 'M' এবং 'N' কোম্পানির পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা করো।

THANK YOU